৫ গিয়াসউদ্দিন বলবন কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি কিভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করেন? [২০১৬-১৭]

→ ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর তুর্কী অভিজাত শ্রেণী ও রাজতন্ত্রের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল তার ফলে নবগঠিত সুলতানি নিয়ন্ত্রণই দুর্বল হয়েছিল। দিল্লি সুলতানির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে প্রয়োজন একজন শক্তিশালী সুলতানের প্রয়োজন ছিল যিনি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবেন। অভিজাতদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীন সত্তাকে খর্ব করে একটি শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। এই প্রয়োজন মেটাতেই গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং দিল্লির সুলতানি শাসনকে সুনিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

ইলতুৎমিসের মতো বলবনের সিংহাসনও নিষ্কণ্টক ছিল না। যদিও ইতিপূর্বে সুলতান নাসিরউদ্দিন মামুদের প্রধান উপদেষ্টা বা 'নায়েব-ই-মামলিকাত' রূপে বলবন কার্যত বেনামে দিল্লির সুলতানি শাসন করেছিলেন। তথাপি সিংহাসনলাভের পর তাকেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বিভিন্ন তুর্কী ও অন্যান্য অভিজাত গোষ্ঠীগুলির ঔদ্ধত্য ও দলাদলি জনিত প্রবণতা। প্রায় শূন্য রাজকোষ, দিল্লির উপকণ্ঠে মেওয়াটি দস্যুদের উপদ্রব, উত্তর-পশ্চিমে মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা, বঙ্গদেশে একটি স্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। অভিজ্ঞ শাসক বলবন ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সমস্যার মূলোচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করেন।

৩ প্রথমত: প্রথমেই বলবন রাজপদের ক্ষমতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। মধ্যযুগীয় ইতিবৃত্তকারদের জিয়াউদ্দিন বরনীর মতে বলবনের পূর্ববর্তী দাস বংশীয় সম্রাট নাসির উদ্দিন মামুদের সময় থেকে রাজক্ষমতার ওপর অভিজাতবর্গের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। রাজদরবার অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বলবন নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করে রাজসভায় নানা

ধারাবাহিক পূর্ণ অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। যথা-
সিজদা, অর্থাৎ সুলতানের সম্মানে নতজানু হওয়া ও
পায়বস অর্থাৎ সুলতানের ~~...~~ পদযুগল চুম্বন করা
প্রভৃতি এবং সর্বসাধারণ-সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরত্ব
বজায় রেখে তিনি অভিজাত ও সাধারণ প্রজার
মধ্যে রাজশক্তি সম্পর্কে একটি ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ
সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলবন মনে করতেন,
"The heart King is the special respretory of gods favour and in these he has no equal mankind." অর্থাৎ রাজার হৃদয় হল ঈশ্বরের বিশেষ প্রতিনিধি এবং এই জন্য তিনি মানুষের সাথে কোনো তুলনা দেখেন না।

দ্বিতীয়ত: রাজসভায় তুর্কী আমীর ও অভিজাতদের নিয়ে যে সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাদের উচ্ছেদ সাধন বলবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষেত্রে তার প্রধান লক্ষ্য ছিল পূর্বতন সুলতানদের নিয়ে গঠিত 'বন্দেগান-চেহেলগান' বা 'চল্লিশ সদস্যের গোষ্ঠী'। সেই গোষ্ঠীকে অবসান করতে গিয়ে জিয়াউদ্দিন বারনী বলেন যে কোনো বংশের বা অভিজাত-পরিবারের অনুসন্ধান করতে ভোলেননি। তিনি তার নিজের আত্মীয় শের খানকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

তৃতীয়ত: অভিজাতদের উচ্ছেদের পর এবং অন্যান্য বিদ্রোহ দমনের জন্য বলবনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল একটি সুদক্ষ ও পুনর্গঠিত সুসজ্জিত বাহিনী, যারা তাকে সবসময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করত।

চতুর্থতঃ জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য বলবন বিচার ব্যবস্থায় কোনো রূপ পক্ষপাতিত্বের সুযোগ রাখেননি।

পঞ্চমতঃ বলবন তার আমলে প্রচলিত ইক্তা বা জায়গীরদারি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি পুরোপুরি দূর করতে না পারলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার যথোপযুক্ত সংস্কার সাধন করেছিলেন। এছাড়া তিনি 'ইমাদ-উল-মুলক' নামক একজন দক্ষ ব্যক্তিকে সামরিক বিভাগের মুখ্য উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করে অপদার্থ ও অযোগ্য সৈন্যদের অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তাদের পরিবর্তে নতুন সৈনিক নিযুক্ত করে উপযুক্ত সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসংগ্রহের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুলতানি সেনা বাহিনীকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহ দমন ও মোঙ্গল দূরীকরণের ক্ষেত্রে সুলতানি বাহিনীর মূল এই পুনর্গঠিত সৈন্যবাহিনী ছিল বলবনের অন্যতম হাতিয়ার।

ষষ্ঠতঃ জিয়াউদ্দিন বরনী লিখেছেন যে বলবন তার রাজত্বের প্রথম বছরটি দিল্লি ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেন। প্রথমে বলবন দিল্লির সন্নিকটস্থ মেওয়াটী দস্যুদের দমনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে এই মেওয়াটি দস্যুদের ভয়ে বণিকদের দল বাণিজ্য করতে পারতো না। সাধারণ মানুষ রাতে নির্ভয়ে ঘুমাতে পারত না। শহর রমনীরা জল সংগ্রহ-এর জন্য প্রধান ফটকের বাইরে গেলে এদের হাতে নানাভাবে হেনস্থ হত। এমন কি এদের ভয়ে মধ্যাহ্নকালীন প্রার্থনার সময় দুর্গপ্রাচীরের পশ্চিম ফটক বন্ধ করে রাখতে হত। জিয়াউদ্দিন বলবন এই অবস্থার অবসান কল্পে দিল্লির চারপাশের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে দেন ও মেওয়াট অঞ্চলের কয়েকটি বিদ্রোহী-অধ্যুষিত গ্রামের উচ্ছেদ সাধন করেন।

অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বহু মেওয়াতিকে হত্যা করেন, গোপালগীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং একাধিক পুলিশচৌকি নির্মাণ করে সেগুলির দায়িত্ব আফগান সৈন্যদের নিয়োজিত করেন। এই সকল চৌকির ব্যয়বহনের জন্য নিষ্কর জমি বন্দোবস্ত দান এবং পরবর্তীতে ঐ সব অঞ্চলে শক্তিশালী ইক্তাদারদের নিয়োগ করেন। সুলতানের বাহিনীর এই নিরন্তর নজরদারীর ফলে দিল্লি দীর্ঘদিনের এক আতঙ্ক মুক্ত হয়।

সপ্তমত: মেওয়াতিদের দমন করার পর বলবন গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চল এবং অযোধ্যার নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। দোয়াবের বিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষ ইক্তাদের নিযুক্ত করে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চরম শাস্তি বিধানের নির্দেশ দেন। বরনী লিখেছেন যে, দক্ষ ইক্তাদাররা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে বিদ্রোহী প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে দোয়াবে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। অযোধ্যার বাণিজ্যপথ তস্কর মুক্ত করার জন্য বলবন স্বয়ং কাম্পিল্য ও পাটিয়ালাতে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন এবং দুষ্কৃতিদের প্রধান ঘাঁটি কাম্পিল্য, পাটিয়ালা এবং ভোজপুরে তিনি দুর্গ নির্মাণ করে আফগান সেনাদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এইভাবে দোয়াব অঞ্চল ও অযোধ্যার বাণিজ্যপথে নিরাপত্তা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টমত: দিল্লি সুলতানির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভয়ংকর মোঙ্গল জাতির আক্রমণের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বলবন কয়েকটি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত লাহোরের সুনাম, সামানা, প্রভৃতি জায়গীর

দুর্গগুলির সংস্কার ও সংগঠন এবং ঐসব দুর্গে স্থায়ী সৈন্য মোতায়েন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

নবমত: বিদেশনীতি: বলবন একজন অত্যন্ত বাস্তববাদী-বিচক্ষণ তিনি আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন। সেই কারণে তিনি রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে-রাজ্য সুদৃঢ়করণে বেশি পরিস্থিতির-বিবেচনায় রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

দশমত: বলবন আত্মবিশ্বাসের সামরিক তৎপরতা প্রদর্শন করে বাংলাদেশের বিদ্রোহী শাসক তুঘ্রিল খানকে পরাজিত ও নিহত করতে সক্ষম হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তুঘ্রিল-বলবনের রাজত্বের অষ্টম বছরে অর্থাৎ ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী হন বলে ইসামীর মনে করেন। কিন্তু বরনীর মতে, তুঘ্রিল রাজত্বকালের ষোড়শ বছরে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। নিজামীর মতে বরনীর এই বিবরণ সঠিক নয়। বলবন ১২৮০ অথবা ১২৮২ খ্রি. বাংলার বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

☐ কে. এ. নিজামী এবং অন্যান্য কয়েকজন

ঐতিহাসিক বলবনের অত্যধিক-নিষ্ঠুরতা নির্ভর শাসননীতির সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া এদের একাংশের মতে-বলবন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার থেকে জাতিগত আভিজাত্যের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বলবনের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সামান্য ক্রীতদাস হিসাবে জীবন শুরু করে তিনি ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা এবং কর্মদক্ষতার দ্বারা দিল্লির সুলতান পদে উন্নীত হয়েছিলেন এবং সাফল্যের সাথে প্রায় কুড়ি বছরকাল সুলতানি রাজনীতির নিয়ন্ত্রক রূপে অতিবাহিত করেছিলেন। প্রাক্-সুলতান পর্বে (১২৪০-৬৬) বলবন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থেকে এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ-দমনে এবং মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে ক্রমশ ক্ষমতার শীর্ষে

আরোহণ করেন। সুলতানি হিসাবে তিনি সুলতানি সিংহাসনের কুবাচা ও তাজউদ্দিনের দুর্নীতি দমন করেন, অভ্যন্তরীণ দেশের মেওয়াটি, দোয়াব প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করে এবং খারিজমাত মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং ভবিষ্যত আক্রমণ-সম্ভাবনা থেকে রক্ষার জন্য সীমান্ত সুরক্ষিত করে তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যের সার্বিক নির্মাণ করেন। তাই ড. ঈশ্বরী প্রসাদ ইলতুৎমিস বাদশাকে মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে অভিহিত করে লিখেছেন: "... a great warrior, ruler and statesman who saved the infant Muslim state from extinction at a critical time."